# ভূমিকা

সাহিত্যধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে গতি ও বাঁকবদল। এটি সাহিত্যের চিরায়ত ধরন, যার ফলে সাহিত্য হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। সাহিত্যিক মানেই তো এই প্রাণের, এই গতির পূজারি। যুগান্তরে সাহিত্যের এই চলনফেরতাই পাঠককে নতুন করে ভাবায় এবং লেখককে প্রাণিত করে। তাই পৃথিবীতে বারেবারে সাহিত্য আন্দোলনের কমতি নেই। 'আভীগার্দ' থেকে 'হাংরি', 'ছোটোগল্প: নতুন রীতি' থেকে 'পোস্টমডার্নিজম' তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তার নতুনতার তারতম্য চিরকালের পাঠককে বুঁদ করে রাখে অধ্যয়নের মৌতাতে।

'অভিনব সাহিত্যকথা'র স্রষ্টারা এরকমই এক আন্দোলনের ঋত্বিক। বাংলা সাহিত্যে নতুন রক্তস্রোত বইয়ে তাকে বহমান রাখাই এঁদের অভিপ্রায়। যে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের দিনাতিপাতের অচলায়তনে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বন্দি, তাতে সৃষ্টির সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে বিশ্বমানলগ্ন করতে চাইছেন অভিনব সাহিত্যকথার শিল্পীরা। এই লেখকরা বিশ্বাস করেন কেবল ইচ্ছাপূরণের কাহিনি বয়ন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে অক্ষম। তাই তাঁরা লিখছেন ও লিখতে চান মেধানির্ভর মননদীপ্ত সাহিত্যকথা। এইসব অভিনব লেখা পাঠকচিত্তে আলোর ঝলকানি যে উসকে দেবে তা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে অভিনব অর্থে তাক লাগানো অদ্ভুতুড়ে, উদ্ভট কিছু নয়, ধ্রুপদী আঙ্গিক অবলম্বনে বা আধুনিক সাহিত্যবিশ্বের শৈলীকে অঙ্গীকার করে নতুন কিছু পরিবেশনই অভিনব সাহিত্যকথার লক্ষ্য।

অভিনব সাত উপন্যাস দিয়ে শুরু করে অভিনব গল্প আঠারোর অন্তর্দৃষ্টি ধ্রুপদী বিন্যাস ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এই সংকলনটিকে জনপ্রিয় করেছে; উদ্বুদ্ধ করেছে অভিনব কথাসাহিত্যের তৃতীয় সংকলন অভিনব অতীতের গল্প। এবার তাদের সংকলিত বিষয় হিংসাবিরোধী গল্প। প্রতিদিন নানারকম হিংসার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। দেশ দখলের যুদ্ধ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই, পাড়ায় পাড়ায় ঘটে চলা প্রাত্যহিক হিংসা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, গাহর্স্থ্য হিংসা, খুন, ধর্ষণ, যৌন অত্যাচার, ধর্মের নামে লড়াই, বর্ণের কারণে নিপীড়ন আমাদের ক্রমাগত ক্লান্ত করে।

কিন্তু এই অস্থিরতা এই ক্লান্তি মানবসমাজের ভবিতব্য হতে পারে না। মুষ্টিমেয়র ভোগ লালসা, নিত্য নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারে উদ্যোগী। দুই বিশ্বযুদ্ধ যেমন রাজনৈতিক কারবারিদের কিছুই শেখাতে পারেনি, তেমনি হিংসার শেষ পরিণতি যে আরেকটি হিংসাতে উপনীত হয়, তাও হিংসার পূজারিরা বিশ্বাস করেননি। দুর্ভাগ্য, অনেক সময় সাধারণ মানুষ গণ হিষ্টরিয়া আক্রান্ত হয়ে হিংস্র আচরণ করেন। এই উন্মত্ততা বন্ধে প্রাচীন কবির আকুলতা, মহামানবদের বাণী, শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কদের আবেদন বারবার ব্যর্থ হয়েছে। তবুও মানুষ আশাবাদী। আমাদের এই সংকলন সেই আশাবাদের গল্প। হিংসা বিরোধিতার গল্প। একদিন সকল হিংসার অবসানে নতুন সূর্য আবাহনের মন্ত্রোচ্চারণ।

**কলকাতা, ১৫.০৫.২০২৫** **মৃগেন সরকার**

| | | |
|---|---|---|
| হিংসক | ৯ | মৃণাল গুহ |
| অসংখ্য মহিমান্বিত হত্যার মধ্যে একটি | ২২ | সুশান্তকুমার বিশ্বাস |
| গহন কালিমা লেগেছে গগনে | ৩৯ | মৃগেন সরকার |
| আদরি | ৫৭ | সঞ্জিতকুমার সাহা |
| কানকাটা | ৬৫ | অমিত মুখোপাধ্যায় |
| মুক্তশোণিত | ৭৪ | দেবাশিস মুখোপাধ্যায় |
| মিলে সুর মেরা তুমহারা | ৮৭ | ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সুগন্ধা | ৯৯ | মলয় শংকর ভট্টাচার্য |
| হ্যালো মা | ১১৬ | অসীম শীল |
| একটি প্রতিবেদনের সন্ধানে | ১২৫ | সুশান্তকুমার বিশ্বাস |
| পরিযায়ী | ১৪৪ | সঞ্জিতকুমার সাহা |
| ভয় হতে তব অভয় মাঝারে | ১৬২ | মৃগেন সরকার |
| প্রসারপাইন | ১৮৩ | দেবাশিস মুখোপাধ্যায় |
| নজর | ১৯৪ | মৃণাল গুহ |

# হিংসক

## মৃণাল গুহ

যোগেনবাবুর হাঁটাটা ভারি অদ্ভুত। সামনে ঝুঁকে, হাতদুটো পিছনে নিয়ে দুই হাতের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে তিনি হাঁটেন। মাথাটাও সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। তাঁকে হাঁটতে দেখলেই সব সময় মনে হয় এই বুঝি তিনি পড়ে গেলেন। পাশের বাড়ির ছেলেটা কাতু, তাঁকে দেখলেই আজকাল সতর্ক করে। কী জানি আজ ক'দিন হল কাতু যেন তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগী। আর তাকে দেখলেই যোগেনবাবু ভিতরে ভিতরে অস্থির ওঠেন। তাঁর মুখটা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠে। অবশ্য কাতু সামনে এলেই তিনি চেষ্টা করেন মুখে একটা কোমল ভাব ফুটিয়ে তুলতে। এই চেষ্টাকৃত কোমলভাব কতটা তাঁর মুখে ফুটে উঠে তিনি জানেন না, বা কাতু সেটা বুঝতে পারে কি না তাও তাঁর জানা নেই। কাতুকে দেখলেই তিনি মনে মনে বলে ওঠেন, "হারামজাদা।"

সেদিনও তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়ির সামনে আসতেই দেখলেন কাতু তার বাইক বারান্দা থেকে নামাচ্ছে। তাঁকে দেখেই কাতু বলে উঠে, "কাকা, সেই আপনি ওভাবে হাঁটছেন। পড়ে যাবেন যে। হাত দুটো পাশে রাখেন না কেন, ব্যালেন্স থাকবে। আর হাতে একটা লাঠি নিন। সাপোর্ট পাবেন। কোন দিন পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড ঘটাবেন।"

যোগেনবাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। কষ্ট করে ঘাড়টাকে বাঁদিকে কিছুটা ঘোরান। চোখের মণি দুটোও বাঁদিকে ঘুরিয়ে কাতুকে দেখেন। চেষ্টা করেন মুখে কোমলভাব ফুটিয়ে তুলতে, তারপর আস্তে আস্তে বলেন, "আর কী পড়ব বাবা! অনেকদিন আগেই তো যা পড়ার পড়ে গেছি।" তাঁর হাতটা কোমরের কাছে উঠে আসতে চায়। তিনি সংযত হন। মনে মনে আবার বলেন, "হারামজাদা।"

যোগেনবাবুর বয়স হয়েছে। তা সত্তর ছুঁতে আর দু-তিন বছর বাকি। ঘাড়টা শক্ত হয়ে গিয়েছে। যথেচ্ছ ঘোরাতে পারেন না। উপর নীচ করাও কষ্টের। তাই পাশের কাউকে দেখতে গেলে এইভাবে খানিকটা ঘাড় ঘুরিয়ে, মণি দুটো ঘুরিয়ে দেখেন। সামনে দেখতে গেলেও মণি দুটোকে যথাসম্ভব ভ্রূর দিকে ঠেলে তোলেন। পা দুটো ঘুরিয়ে সমস্ত শরীরটা পাশ ফেরানোর পরিশ্রমটা আর তিনি করে ওঠেন না।

যোগেনবাবুর এই রকম অদ্ভুত হাঁটার ভঙ্গি অনেক সময়ই অনেকের হাসির কারণ হয়। অবশ্য সেটা বেশি দূর গড়ায় না। কেউ না কেউ থামিয়ে দেয়। এই তো লক্ষীপূজার দিন সকালে চায়ের দোকানে ওরা চা খেতে খেতে আড্ডা মারছিল। রাস্তার ওধারে যোগেনবাবু কার সঙ্গে যেন ওইভাবে ঘাড় কাত করে মণি ঘুরিয়ে কথা বলছিলেন। কাতু বলে উঠল, "যোগেনকাকা আজকাল বাঁকা নজরে দুনিয়া দেখেন।"

সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের দোকানদার পচা বলে উঠল, "এটা তোমার কীরকম কথা কাতুদা। ওঁর কষ্টটা তুমি বুঝলে না?"

"না, না, আমি ওভাবে বলতে চাইনি, পচা। আমি এমনিই মজা করছিলাম।" কাতু মিইয়ে গিয়ে বলে।

শিবেন চা খেয়ে খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে, "কাতু, তোর সাথে তপনের আকচাআকচি ছিল। ওর হাতে তুই মারও খেয়েছিস কয়েকবার মেয়েদের সাথে নোংরামি করার জন্য। দলও পাকিয়েছিলিস তপুর এগেন্সটে। কিন্তু কিছুই করতে পারিসনি। পাড়ার লোক তপনের পাশে দাঁড়িয়ে গেছিল। এই বাড়াবাড়িটা ঘটেছিল ওই যে কী নাম মেয়েটা..."

"ঝিমলি", দীনেশ মনে করিয়ে দেয়।

"হ্যাঁ, ঝিমলির সাথে যখন অসভ্যতাটা করেছিলি। সবাই সবটা জানি। যাক, মনে হয় নিজেকে কিছুটা পালটেছিস। সেই সব সঙ্গী সাথী ছেড়েছিস। তাই এদের সাথে বসে চা খেতে পারছিস। কিন্তু শোন, তপন তো পুলিশের গুলি খেয়ে কবেই মরেছে। সেসব তো এখন চুকে বুকে গেছে। আর কেন ওর বাপটাকে নিয়ে পড়েছিস?"

কাতু থতমত খেয়ে যায়। মিইয়ে গিয়ে বলে, "শিবেনদা তুমিও ভুল বুঝলে? তপনের সাথে আমার যাই থাক। ওদের বাড়ির আর কারও সাথে আমার কিছু ছিল না। আমাদের পাশাপাশি দুই বাড়ির মধ্যে তখনও যাতায়াত ছিল, এখনও আছে। এই তো দশমীর পরের দিন কাকা আর কাকিমাকে

বিজয়ার প্রণাম করে এলাম। আর তপনের সাথে আমার ঝামেলা তো অনেক আগের। কত বছর হয়ে গেল বলো তো? তপন হাইয়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ঝাড়গ্রাম চলে গেল ডিপ্লোমা পড়তে, সেই তখন থেকেই আমার সাথে আর যোগাযোগ নেই। বহুদিন তো ওর নিজের বাড়ির সাথেই ওর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তারপর শুনেছিলাম রাতবিরেতে নাকি আসত। সে কখন আসত, কখন যেত কেউ জানে না।"

"নারে কাতু, ঝিমলির ব্যাপারটা ঘটেছিল তপন ঝাড়গ্রামে চলে যাওয়ার পর। ও বোধহয় কীসের একটা ছুটিতে বাড়ি এসেছিল তখন", বলে দীনেশ। কাতু আর কিছু বলে না। মাথা নীচু করে চায়ে চুমুক দেয়।

শিবেন পচাকে পয়সা দিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়, বলে, "চলি..."

"কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেছ শিবেনদা?" বিশু বলে।

"কী রে?" শিবেন দাঁড়িয়ে পড়ে।

"যোগেনকাকা এই শরীর নিয়েও কীরকম অ্যাকটিভ দেখেছ। সারাদিন কীরকম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর বাড়ি থাকলে মোড়ায় বসে বাড়ির পিছনের জমিতে খুরপি চালাচ্ছেন, এ গাছ সে গাছ লাগাছেন, মানে সব সময়ই ব্যস্ত।"

"কাকার ঘাড়টাই যা শক্ত হয়ে গেছে, স্পন্ডোলোসিস। ঠিক ভাবে চিকিৎসা হয়নি। এমনিতে ভালোই শক্ত আছেন। তুই ব্যস্ত থাকার কথা বলছিস, কিন্তু এছাড়া কী আর করবেন বল? চুপচাপ বসে থাকলে তো ওইসব কথাই মনে আসবে। আসলে উনি নিজেকে ব্যস্ত রেখে সব কিছু ভুলে থাকতে চান। আর তাছাড়া বাড়িতে কথা বলার লোক কই। শুনেছি, ওই ঘটনার পর কাকিমা কথা বলা ছেড়েই দিয়েছেন। এটা অবশ্য কাতু ভালো বলতে পারবে, পাশাপাশি বাড়ি তো।"

শিবেনের এই পাশাপাশি শব্দটার ভিতরে যে শ্লেষ ছিল তা অন্য সবার সঙ্গে কাতুর কানেও ধরা পড়েছিল। কিন্তু কাতু বুঝেও না বোঝার ভান করে বলে, "হ্যাঁ, এটা ঠিক শিবেনদা। তপন গুলি খেয়ে মরার পর কাকিমা যেন কীরকম হয়ে গেছেন। এমনি কাজকম্ম সবই করছেন। কিন্তু চুপচাপ। কেউ কিছু বললে চুপ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর একসময় সরে যান।"

"স্বাভাবিক, এই বয়সে এসে একমাত্র ছেলের মৃত্যু, তাও ওইভাবে, ভাবা যায় না", অনিল আস্তে আস্তে বলে।

"ঠিক বলেছিস। সন্তান যে কী, এখন বাবা হয়েছি বুঝতে পারি", দীনেশ বলে।

"কালীপূজার দিন ঘটনাটা ঘটেছিল না?" শিবেন জানতে চায়।

"হ্যাঁ, গত বছরের আগের বছর। আর গত বছর কালীপূজার দিন, সে এক কাণ্ড। কাকা সারারাত ঘরেই ফিরল না। কাকিমার কিন্তু কোনও হেলদোল নেই। সকালে কাজের মেয়েটার কাছ থেকে জানতে পেরে আমরা সবাই খুঁজতে বের হই। শেষে একসময় দেখি কাকা রিকশা করে বাড়ি ফিরছেন। সন্ধে বেলায় শ্মশানে গিয়েছিলেন, সারারাত শ্মশানেই কাটিয়েছেন।"

পচা বলা শেষ করলে শিবেন বলে, "দেখেছিস, এত করেও কাকা ভুলতে পারে না। আরে ভোলা কী অত সহজ! ছেলের মৃত্যুর দিন ঠিক শ্মশানে চলে গিয়েছিলেন।"

কিন্তু, দীনেশ বলে, "অত রাত্রে তপন বাড়ি এসেছিল পুলিশ জানল কী করে? এখান থেকে নিশ্চয়ই কেউ পুলিশকে জানিয়েছিল।"

"যাঃ, এখান থেকে কে আবার পুলিশকে খবর দেবে দীনেশদা", পচা বলে।

"নিশ্চয়ই কেউ খবর দিয়েছিল, পচা। নয়তো পুলিশ জানবে কী করে?" বিশু বলে।

আলোচনা এরপর ঘুরে যায় পুলিশকে কে জানাল সেই তর্কে। একদিন এ পাড়টা তোলপাড় হয়েছিল যে প্রশ্নে।

শিবেন বলে, "তোরা চালিয়ে যা। আমি চলি। কাকা যাচ্ছে, গিয়ে দুটো কথা বলি।" শিবেন চলে যায়। ওদের আলোচনা চলতেই থাকে।

আড্ডা সেরে বাড়ি ফেরার পথে কাতু ভাবে বড্ড বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে ও। তাই আজ এত দিন পর পুলিশকে কে খবর দিয়েছিল কথাটা আবার উঠে পড়ল। নাঃ এভাবে কথা বলা আর ঠিক হবে না। বরং কাকার কাছাকাছি থাকি সেটাই দেখাতে হবে লোককে।

দুর্গাপূজার ক'দিন আগে যোগেনবাবু যথারীতি বাগানে কাজ করছিলেন। আজ বেশ কিছুদিন হল তাঁর নজরে এসেছে বাড়ির দেয়াল আর পাঁচিলের মাঝের ওই ঘুঁবচিতে বেশ আবর্জনা জমেছে। কতদিনের আবর্জনা কে জানে, সাফ করা দরকার। কিন্তু পেরে উঠছিলেন না। কাল জায়গাটা খানিকটা পরিষ্কার করেছেন। তখনই তিনি দেখেছেন সেসব আবর্জনার নীচে কাচের টুকরো, শিশি বোতল ভাঙা, কাপ ডিস ভাঙা সব জমে আছে। বুঝতে

পারলেন এটা ওই কাজের মেয়ের কাজ। ভাঙা কাচ এখানে ফেলার কথা নয়। কাজের মেয়েটা ফাঁকি মেরেছে। এগুলো বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসার পরিশ্রমটুকু আর করেনি। কতদিন এভাবে মাল জমিয়েছে কে জানে। আজ তিনি সাবধানে খুরপি দিয়ে কাচের টুকরোগুলো তুলছিলেন। অনেকটা পরিষ্কার করার পর তিনি বুঝতে পারলেন মাটির খানিকটা নীচে প্লাস্টিকে মোড়া কী যেন একটা আছে। বেশ কিছুটা চেষ্টার পর তিনি সেটা তুলতে পারলেন। মোটা প্লাস্টিকে মোড়া জিনিসটা দেখার পরই তাঁর অভিজ্ঞতা বলে দিল ওটা কী হতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁরও কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে।

কলেজে পড়ার সময় তিনিও একদিন সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে ঝাঁপিয়েছিলেন। চুয়াত্তরে ধরা পড়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন তাঁর শরীরের উপর কী চলেছিল তার চিহ্ন এখনও তাঁর শরীরে রয়ে গিয়েছে। তবু তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। অনেকে তো আর বেঁচেই রইল না। আরও অনেকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

জেলে থাকতেই মা মারা গেল। পুলিশের গাড়িতে তিনি যখন শ্মশানে গেলেন তার আগেই দাহ হয়ে গিয়েছে। চিতায় জল ঢালা হচ্ছে। তিনি হাতকড়া পরা অবস্থায় বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাকিয়েও দেখেননি। তাঁর সমস্ত মনোযোগ ছিল সেই নিভে যাওয়া চিতার দিকে। সঙ্গের পুলিশ অফিসার অত্যন্ত মানবিক গলায় জানতে চেয়েছিল তিনি আরও কিছুক্ষণ থাকতে চান কি না। তিনি মাথা নেড়েছিলেন।

সাতাত্তরে সরকার পালটাল। বন্দি মুক্তির সুবাদে ছাড়া পেলেন। বাড়ি ফিরে এলেন। বাবা আয় বলে ডেকে নেননি। আবার বাড়ি থেকে চলে যেতেও বলেননি। তিনি থেকে গেলেন।

বাড়ির পাশাপাশি দুটো ঘরে দুটো একাকী জীবন। মায়ের মৃত্যুর জন্য বাবা হয়তো তাঁকে পরোক্ষে দায়ী করতেন, এটা তাঁর ভাবনায় আসত। আর তাঁর বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। যতদিন বাবা বেঁচেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। তাঁর মনে হত এর থেকে যদি বাবা তাঁকে বকাবকি করতেন, মারধোর করতেন সেটা অনেক ভালো ছিল। পরক্ষণেই তাঁর মনে হত প্রাপ্তবয়স্ক এত বড়ো ছেলেকে সেসব আর কী করে করবেন। কিন্তু বাবার এই ভয়ঙ্কর নীরবতা তাঁকে ভয়ানক নিপীড়ন করত। তিনি কষ্ট পেতেন। কিন্তু বাবা একই রকম রয়ে গেলেন। শুধু ক'বছর পর মারা যাওয়ার আগে তাঁর দিকে বহু বছর পর তাকিয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ চোখ মেলে। কিছুই বলেননি।

তবে তাঁর সেই নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তিনি কোনও অনুযোগ দেখতে পাননি। বরং তাঁর মনে হয়েছিল সেই দৃষ্টিতে যেন কিছুটা মমতা মাখানো ছিল।

বাবা মারা যাওয়ার আগেই তিনি অবশ্য একটা চাকরি পেয়েছিলেন। স্কুলের এক মাস্টারমশায়ের সুপারিশে। একটা চেন তৈরির কারখানায়। সেখানেই আলাপ হয়েছিল প্যাকেজিং সেকশনের রানুর সঙ্গে। নিম্নবিত্ত পরিবারের সাধারণ চেহারার রানুকে তিনি বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন বাবার মৃত্যুর পর। তারপর খোকা এল। সেই তপু...

তিনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেট। হঠাৎই সচকিত হলেন তিনি। চারদিকে তাকালেন, না আশেপাশে কেউ নেই। তিনি প্যাকেটটা কোমরে পাঞ্জাবির নীচে গুঁজে ঘরে এলেন। রানু তখন রান্না ঘরে।

রানুকে কিছু বলতে চান না তিনি। ও তো এখন আর ওর মধ্যে সেইভাবে নেই। এটাই মুশকিল হয়েছে যোগেনবাবুর। নিজের কথা, নিজের ব্যক্তিগত কথা শেয়ার করার এখন আর কেউ নেই। তিনি তপুর ঘরের ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে গেলেন। এই ঘরটা আর ব্যবহার হয় না সেইভাবে। সকালে কাজের মেয়েটা এসে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে মুছে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়। পরের দিন কাজের মেয়েটা না আসা পর্যন্ত ভেজানো দরজা ভেজানোই থাকে। ভিতরে ঢুকে তিনি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করলেন। প্লাস্টিকের মোড়ক খুলতে বেরিয়ে এল একটা রিভলবার। বুঝতে পারলেন তপুর জিনিস। আর এটার জন্যই সেদিন পুলিশ হন্যে হয়ে উঠেছিল। তাঁর এখন মনে হল কাজের মেয়েটা ওখানে ভাঙা কাচগুলো ফেলেনি। এটা তপুর কাজ। এটা মাটিতে পুঁতে দিয়ে উপরে কাচ ছড়িয়ে, গেঁথে আর নোংরা আবর্জনায় ঢাকা দিয়েছিল তপু। তাহলে এই ভাঙা কাচ কী সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তপু? ও কি তাহলে সেই রাত্রে অনেকক্ষণ আগেই এসেছিল? তাঁর বুক ভেঙে একটা শ্বাস বেরিয়ে এল। এসব এখন আর কিছুই জানা যাবে না।

তিনি দেখলেন জিনিসটা এমনিতে ঠিকই আছে। তবে এখনও কাজের আছে কি না বুঝতে পারলেন না। মোটা প্লাস্টিকে ভালোভাবে প্যাক করা থাকলেও এতদিন মাটির নীচে ছিল। তবে জিনিসটা মুঙ্গের মার্কা নয়। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বিলি করা সরকারি জিনিস। হয়তো কখনও পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র।

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে তপুর ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠার ছবিগুলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। তপুর খুব ছোটোবেলায় তেমন কিছু

বুঝতে পারেননি তিনি। কিন্তু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তপু কীরকম একরোখা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে লাগল। কোনও অন্যায় দেখলেই সামনে গিয়ে দাঁড়াত। তিনি ভয় পেতেন। তপুর মধ্যে তিনি যেন নিজেকেই খুঁজে পাচ্ছিলেন।

তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তখন উজার করে তপুকে বলতে শুরু করলেন। যদি সে সব শুনে তপু সাবধান হয়। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়। তাঁর জেলে যাওয়া, জেলের সেই অত্যাচার সবই একে একে বলতেন। নিজের এখনও বেঁচে থাকা, কিন্তু কত কত তাজা ছেলের অকারণে অকালে মরে যাওয়ার কথাও বলতেন। নাম ধরে ধরে সেই সব অকাল মৃত সঙ্গীদের জীবনের কথা বলে যেতেন অনর্গল। যৌবনের উন্মাদনায় অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় এই সব হতভাগ্যের দল পরিবার পরিজনদের ছেড়ে নেমে এসেছিল দেশোদ্ধারের টানে। কিন্তু কী করতে পেরেছিল তারা? আবার কিছু কিছু সেই সব নেতাদের কথাও বলেছিলেন যারা এই তরুণদের উজ্জীবিত করে টেনে এনেছিল এই মরণ খেলায় আর নিজেরা সব চুকে বুকে যাওয়ার পর এখন স্বদেশে বা বিদেশে উচ্চকোটির জীবন যাপন করছে।

তিনি বার বার আক্ষেপ করে বলতেন দেশ, দেশের মানুষ, তো দূরের কথা, নিজের একান্ত আপনজন বাবা মায়ের জন্যও কিছুই করেননি। তাঁদের কাছ থেকে নিয়েছেন দু-হাত ভরে, বিনিময়ে তাঁদের দিয়েছেন শুধুই দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ। মায়ের মৃত্যু, জেল থেকে হাতকড়া পরে শ্মশানে যাওয়া, তাঁকে শেষ দেখতে না পাওয়া এই সবই একটু একটু করে বলতেন তপুকে। একই বাড়িতে থেকে বাবার সঙ্গে সম্পর্কহীনতার সেই সব অসহ্য দিনগুলোর কথা বলতে বলতে তাঁর গলা মাঝে মাঝে বুজে আসত।

কিন্তু তিনি বুঝতেও পারেননি তপুর মনে এসবের কোনও ছাপ পড়েনি। নিয়তি নির্ধারিত পথেই তপু এগিয়ে যাচ্ছিল। তিনি সেইদিন প্রথম বুঝতে পারলেন যেদিন অনেক রাত্রে পুলিশ এল তপনের খোঁজ করতে। তিনি জানতে পারলেন তপু কলেজে যাচ্ছে না। এমনকি কলেজ হোস্টেলেও নেই। উগ্র রাজনীতির ডাকে সে এখন ফেরার। পুলিশ অফিসার যোগেনবাবুকে অনেক জ্ঞান দিয়ে বলে গেলেন তপু এলেই যেন থানায় খবর দেওয়া হয়।

যোগেনবাবু হতবাক। শেষমেশ তপুও বাবার পথ ধরল। সেই একই ভুল। তিনি বুঝতেও পারলেন না? ইদানীং ওর বাড়ি আসাটা কমে গিয়েছিল। বলত পড়াশোনার চাপ, পরপর সেমিস্টার সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। রানু তো চিন্তায় ভাবনায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি নিজেকেই সামলাতে

পারছেন না, রানুকে আর কী সামলাবেন।

পুলিশ মাঝে মাঝে আসত খোঁজ করতে। একদিন তাদের আসা বন্ধ হল। উলটে তিনি থানায় যাতায়াত শুরু করলেন খবর পাওয়ার আশায়। কিন্তু তপনের কোনও খবরই আর পাওয়া গেল না।

তারপর একদিন, বছর খানেক পর, অনেক রাত্রে তপন এল। ওর নাকি মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। বেশিক্ষণ থাকেনি। মিনিট কুড়ি পর চলে যাওয়ার আগে মাকে বলল ঘরে কোনও খাবার, চিঁড়ে, মুড়ি আছে কি না। ঘরে যেটুকু মুড়ি ছিল পোঁটলা করে নিয়ে চলে গেল।

এরপর আরও বার তিনেক এসেছে। ওই দুই তিন মাস পর পর। শেষ এসেছিল সেই কালীপূজার দিন। যোগেনবাবু পূজার শেষে ভোগ নিয়ে প্যাণ্ডেল থেকে ফিরেছিলেন রাত প্রায় দুটোর সময়। রানু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল তপু। ও অন্ধকারে কোথাও অপেক্ষা করছিল বাবার ফেরার জন্য।

ঘরে ঢুকেই বলেছিল, "মা ঘরে কিছু খাবার আছে।" তিনি ভোগের শালপাতার মোড়কটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। গোগ্রাসে ওর খাওয়া দেখে তিনি বুঝতে পারছিলেন সারাদিন ওর নিশ্চিত খাওয়া জোটেনি।

তিনি একবার বলেছিলেন, "আর কেন, এবার সারেণ্ডার কর। না হয় কিছু দিন জেল খাটবি।"

মুখ ভর্তি খিচুড়ি মুখে নিয়ে ও বলেছিল, "দেখি।"

তপুর ওই দেখি বলাটা বড়ো আশা জাগিয়েছিল তাঁর মনে। তপুর খাওয়া শেষ হতে না হতে ওর অভ্যস্ত কান বুঝি কিছু টের পেয়েছিল। খাওয়া ফেলে রেখে ঝোলাটা টেনে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে মুহূর্তমধ্যে ও বেরিয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। রানু দরজা খুলে দিলে রিভলবার হাতে পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকেই জানতে চায়, "তপন কোথায়?"

"আমরা জানি না", রানু বলে।

"আচ্ছা জানেন না? তা ভোগ খাচ্ছিল কে?" শালপাতার মোড়কটা দেখিয়ে বলেন অফিসার।

"আমি", যোগেনবাবু মরিয়া হয়ে বলে উঠেছিলেন।

"আচ্ছা, আপনি খাচ্ছিলেন? অথচ আপনার হাতটা পরিষ্কার, ভোগ লেগে নেই।" তারপরই ব্যস্ত হয়ে বলেন, "চলুন সবাই, কুইক। বেশি দূর যেতে

পারেনি।" দলবল নিয়ে অফিসার বেরিয়ে যান। ঘরের মেঝেতে নিথর হয়ে বসে থাকেন যোগানবাবু আর তাঁর স্ত্রী, রানু।

মিনিট পঁচিশ পর তাঁরা দুটো শব্দ শুনতে পান। ওগুলো কালীপূজার পটকার আওয়াজ নয়, দুজনই বুঝতে পারেন। আধঘণ্টা পর তপনের মৃত শরীরটা টানতে টানতে বাড়ির সামনে নিয়ে আসে পুলিশ। রানু গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তপনের বুকে।

পুলিশ অফিসার বলে, "ওটা কোথায়? ঝোলাতে নেই দেখছি, বের করুন।"

"আপনি কীসের কথা বলছেন অফিসার আমি বুঝতে পাচ্ছি না?" যোগেনবাবু তপনের মরা শরীরটার দিকে তাকিয়েই বলেন।

"বুঝতে পারছেন না? আমি অস্ত্রটার কথা বলছি। ওর সাথে রিভলবার ছিল, আমাদের খবর আছে, সেটা কোথায়?"

"রিভলবার?" এবার আশ্চর্য হয়ে যোগেনবাবু তাকান অফিসারের দিকে, বলেন, "আমরা জানি না, আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন।"

"তাই দেখব।"

তারপর শুরু হল খোঁজার নামে তাণ্ডব। বিছানাপত্র তছনছ করে, খাটের তলা, আলমারি, বাক্স, ব্যাগ কিছুই আর বাদ গেল না। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। প্রতিবেশি মহিলারা রানুকে ঘরে এনে তখন বসিয়ে দিয়েছে ঘরের এক কোণায়, মেঝেতে। পুলিশের দল ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে রান্নাঘরে। চাল ডালের কৌটা থেকে মশলাপাতির শিশি কৌটা সব উপুড় করে মেঝেতে ফেলছে। কিন্তু অস্ত্র আর পাওয়া গেল না। হঠাৎ একজন ঠাকুরের আসন দেখিয়ে বলল এখানে নেই তো। রানু বাধা দিতে গিয়ে পুলিশের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। মাথাটা সজোরে গিয়ে লাগল দেয়ালে। তারপর একসময় বাড়ির দরজায় পাহারা রেখে তপনের মৃতদেহটা নিয়ে পুলিশ চলে গেল। প্রতিবেশীরা এক এক করে চলে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিঝুম হয়ে বসে থাকে মেঝেতে। এরপর একসময় সেইখানেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালের আলো ফোটার পর পুলিশ আবার ফিরে আসে। শুরু করে বাড়ির আশপাশ, বাগান, ঝোপঝাড় তছনছ করে তল্লাশি। প্রতিবেশিরা আবার এসে জড়ো হয়। শিবেনের যাটোর্ধ্ব বাবা বলেন, "অস্ত্র এখানে রেখে যাবে কেন? সঙ্গে থাকলে তো পালাতে সুবিধা হত।"

"অভিজ্ঞতা আছে দেখছি!" বাঁকাভাবে পুলিশ ইনস্পেকটর বলে।

"অভিজ্ঞতা নয়, অনুমান। আমার অনুমান তাই বলে।"

"হুঁ, তা আপনি কী করেন?"

"এখন কিছুই করি না। রিটায়ারমেন্টের আগে জেলা জজ ছিলাম।"

"ও, আচ্ছা। তপনকে চিনতেন? কীরকম ছেলে?"

"ভালো ছেলে বলেই তো চিনতাম। অবশ্য এখনকার খবর জানি না। সে তো আপনারা ভালো বলতে পারবেন।"

"ভালো ছেলে?"

"হ্যাঁ, ভালো ছেলে। আর সেই জন্যই তো এই রাস্তায় পা বাড়িয়েছিল।"

"মানে?"

"মানে এ রাজনীতিতে ভালো ছেলেরাই এগিয়ে যায়। অন্যরা যায় অন্য রাজনীতিতে। যেটা সেফ, আবার ডিভিডেন্টও আছে। রাজনীতি করাটাও তো এখন একটা পেশা। যেমন আপনার পুলিশের চাকরি। আমারও একটা ছিল..."

ইনস্পেকটর এগিয়ে আসেন সামনে। বলেন, "আপনি তো জানেন, আমাদের সার্ভিসে রাজনীতি করা চলে না। প্রকাশ্যে, ইউনিফর্ম পরে এভাবে তো নয়ই। চলি। তবে আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন, এই অবস্থায় অস্ত্র বোধহয় কেউই কাছছাড়া করে না।"

আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ চলে যায়। দিন তিনেক পর তপনের শরীরটা পেয়ে তিনি শ্মশানে দাহ করে আসেন।

তপনের মৃত্যু নিয়ে পাড়ায় তখন প্রবল আলোচনা। তার সিংহভাগ ছিল পুলিশ কী করে টের পেল, কে খবর দিয়েছিল পুলিশকে। একসময় আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনা থিতিয়ে আসে। শুধু যোগেনবাবুর মনে থেকে গিয়েছিল প্রশ্নটা। আর বেশ কয়েকমাস পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন তাঁর অনুমান সঠিক। তাই এখন কাতু গায়ে পড়ে দরদ দেখাতে এলে তিনি প্রকাশ্যে মুখে কোমলভাব ফুটিয়ে তুললেও ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠেন।

বড়ো একটা শ্বাস তাঁর বুক ভেঙে বেরিয়ে আসে। তিনি হাতের অস্ত্রটার দিকে তাকান। খুলে দেখেন পাঁচটা গুলি আছে। গুলিগুলো চেম্বার থেকে বের করে হাতে নিলেন। গুলিগুলো তাঁর মনে হল ঠিকই আছে। তবে একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। তিনি হ্যামার, ট্রিগার, সিলিণ্ডার সব কিছুই

খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে জিনিসটা এখনও কাজের আছে। তিনি রিভলবারটা বন্ধ করে খাটের থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পুরোপুরি সোজা হতে পারলেন না। কোমরটা একটু বেঁকেই রইল। ডান হাতটা সোজা সামনে বাড়িয়ে ধরে ট্রিগারে চাপ দিলেন। কট্ করে আওয়াজ হল। না, ট্রিগার তাহলে ঠিক কাজ করছে। তবে, তিনি কী পারবেন? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন তিনি। তারপর দৃঢ় হাতে গুলিগুলো চেম্বারে ভরতে ভরতে নিজেকেই বললেন, তাঁকে পারতেই হবে।

তিনি রিভলবারটা লুকিয়ে বেরিয়ে এসে বাগানে ফিরে গেলেন। কাচের বাকি টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে করতে ভাবতে লাগলেন কোথায় কবে অস্ত্রটা পরীক্ষা করবেন। জায়গাটা পরিষ্কার করে তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। ক'দিন পর অষ্টমী। সেইদিন তিনি প্যাণ্ডেলে যাবেন। কিছু পরে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন দূরে গাঙ্গুলিদের আম বাগানের ভিতর দিয়ে একবারে রেল লাইনের ধারে নয়ানজুলির কাছে। দূরে ওই নির্জনে পরীক্ষা করে দেখবেন অস্ত্রটা ঠিক আছে কি না। তিনি জোরে হাঁটতে পারেন না। তবুও ঠিক ফিরে আসতে পারবেন সন্ধিপূজার আগেই প্যাণ্ডেলে।

অষ্টমীর দিন রিভলবারটা কোমরে গুঁজে প্যাণ্ডেলে এলেন। কিছুক্ষণ পর প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন গাঙ্গুলিদের আমবাগানের দিকে। কেউ আশেপাশে নেই নিশ্চিত হয়ে আমবাগানের ভিতর দিয়ে তিনি হাজির হলেন নয়ানজুলির কাছে। ঢোল কলমির জঙ্গলে ঢুকে একবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কিছু পরে একটা ট্রেন আসার শব্দ পেয়ে রিভলবারটা বের করে প্রস্তুত হলেন। ট্রেনটা তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়ার আগেই রিভলবারের নলটা জলের কছাকাছি নিয়ে ট্রিগার চাপ দিলেন। একটা ধাক্কা, তার সঙ্গে একটা শব্দ, নয়ানজুলির জল উছলে উঠল। তাঁর মুখে এখন হাসি। এই হাসি আজ কতদিন পর তিনি হাসলেন। নলটার কাছে হাত দিলেন, গরম। আলগা হাতে সেই উষ্ণতা অনুভব করতে করতে তিনি যেন তাঁর তপনের শরীরের ওম উপভোগ করতে লাগলেন।

এখন তিনি বেরোলেই ওটা তাঁর কোমরে গোঁজা থাকে। কাতুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর অবাধ্য হাত কোমরের কাছে উঠে আসতে চায়। নিজেকে কষ্টে সংযত করেন। মনে মনে বলেন, এখানে নয়, এখানে নয়। ধরা পড়া

চলবে না। তাঁকে বেঁচে থাকতেই হবে রাণুর জন্য। তাঁকে ছাড়া রাণু যে বড়ো অসহায়।

কাল কালীপূজা, আজ চতুর্দশী। বিকেলে রাণু মেঝেতে বসে মাটি দিয়ে চোদ্দটা প্রদীপ তৈরি করছিল। খাটে বসে যোগেনবাবু তাই দেখছিলেন। প্রতি বছরই রাণু এটা করে। কাঁচা মাটির প্রদীপ তেল টানে না। তেলের সাশ্রয় হয়। কাল অবশ্য মোমবাতি জ্বালানো হবে।

রাণুর প্রদীপ বানানো শেষ। সে হাত ধুতে গেল। যোগেনবাবু বাইকের আওয়াজ পেয়ে জানালা দিয়ে দেখলেন কাতু বাইকে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে বাঁদিকে চলে গেল। ও এই উলটোদিকে কেন? ভাবলেন যোগেনবাবু। তারপরেই মনে হল ও চোলাইয়ের খোঁজে যাচ্ছে না তো। কিছু একটা ভাবলেন যোগেনবাবু। তারপর খাট থেকে নেমে ধীরে সুস্থে জামা কাপড় পালটালেন, রিভলবারটা কোমরে গুঁজে বের হয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরলেন।

যোগেনবাবুর কোনও তাড়াহুড়ো নেই। তিনি জানেন চোলাই কিনে ফিরতে কাতুর সময় লাগবে। অবশ্য ও এই দিক দিয়ে নাও ফিরতে পারে। চোলাইয়ের দোকান থেকে আরও এগিয়ে শ্মশানের ওপাশ দিয়ে ফিরতেও পারে। কিন্তু যোগেনবাবু সুযোগ ছাড়তে নারাজ। তিনি হাঁটতে থাকলেন।

এই রাস্তাটায় ঘর বাড়ি কম। খানিক দূর এগোলেই রাস্তার দু'পাশের বাড়ি ঘর কমতে থাকে। আর তার কিছুটা পরেই পরিত্যক্ত ইটভাঁটাটার বিশাল ফাঁকা জায়গাটা। তার একটু পরেই রাস্তাটা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে শ্মশানের দিকে। যোগেনবাবু চাইছিলেন ইটভাঁটার কাছে যদি কাতুর সাথে দেখা হয়। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এই সবই ভাবছিলেন।

কিন্তু ইটভাঁটার একটু আগেই দেখলেন কাতু ফিরে আসছে। তাঁর হাত কোমরের কাছে উঠে আসার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে। তিনি দেখলেন কম হলেও কিছু চালাঘর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। লোকজন দেখা যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু ভিতরে থাকতে পারে। তাছাড়া কালীপূজার পটকা অল্পবিস্তর যা ফাটছে তাতে গুলির আওয়াজ চাপা পড়বে না। শব্দ শুনে ভিতরের মানুষজন যদি বেরিয়ে আসে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই কাতু এসে বাইক থামিয়ে বলে, "কোথায় যাচ্ছেন কাকা?"

"শ্মশানে।"

"কিন্তু কালীপূজা তো কাল, আজকে..."